৪৬শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৭৩ | ৭ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অনশন একটা দাবি আদায়ের ফিকির

দাবি আদায়ের অমোঘ অস্ত্র হিসেবে অনশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিশুরা যখন তাদের দাবির বিষয়ে কিছুতেই অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না, তখন শুরু করে একটানা কান্না। আমাদের দেশেও শিশু-সুলভ ঘটনার অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে! বিচারশীল বিতর্কের দ্বারা যখন কিছুতেই প্রতিপক্ষকে স্বমতে আনা যায় না, তখন অন্ধ আবেগের দ্বারা নিজের দাবির বিষয়ে অপরকে প্রভাবিত করে কার্য সাধন করাই অনশনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের অনশনব্রতীদের অনেকেই গান্ধীজির উদাহরণ দেখান। কিন্তু গান্ধীজি আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে অনশন অনশন হয়, সেগুলির স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে—চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায় করে নেওয়া। এই অন্ধ আবেগের আবহাওয়ার মধ্যে, এই চাপ সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যে কোন সত্যকার রাজনৈতিক বিতর্ক চলে না। অথচ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত স্থির করার যে সব প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি আছে, সেগুলি এড়িয়ে গিয়ে কিছু সংখ্যক লোক যদি নিজেদের ইচ্ছা সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এই 'ব্ল্যাকমেইল'-এর রাজনীতির শেষ কোথায়?

ভারতের দুই প্রান্তে এক সন্ন্যাসী ও এক সন্তের অনশন সম্পর্কে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সন্ত ফতে সিং এবং জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য—দু'জনেই নিজ নিজ অনুগামীদের

প্রশ্ন নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন এবং জগদ্‌গুরুও যে-প্রশ্নে অনশন করছেন, তার গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। এই অনশনের ফলে যদি কোন অনভিপ্রেত বিপদ হয়, তাহলে তাঁদের অনুগামীরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অনুগামীরা তখন দেশের কোথায় যে কি কাণ্ড করে বসবেন, তার স্থিরতা নেই।

এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেছেন, তা' সত্যই প্রশংসার্হ। তিনি বলেছেন, পুরীতে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের অনশনের দ্বারা স্থির হবে না যে, সারা দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, বা সন্ত ফতে সিং-এর অনশন বা আত্মবিসর্জনের দ্বারা পাঞ্জাব-হরিয়ানার সমস্যার সমাধান হবে না।

সমস্ত যুক্তি-বিতর্ক বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র অন্ধ আবেগ-শক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া যে মোটেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, সেকথা কারো অবিদিত নাই। সন্তজীর অনশন ও সম্ভাব্য আত্মবিসর্জন সম্পর্কে এবং জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের অনশন সম্পর্কে দেশের মধ্যে বহু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন্ নীতির বলে এঁরা দাবি আদায়ের অস্ত্র হিসাবে অনশনকে বেছে নিয়েছেন? ধর্মগুরু-রূপে এঁরা সম্মানিত, এবং এঁদের বহু অনুগামীও রয়েছেন। কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এঁরা যদি রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন, তাহলে সেটা দেশের পক্ষে মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।

ঈশ্বর ভজনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা—দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক কর্মধারা। একের অপরের সীমানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করলে, তাতে বিরোধের সমূহ সম্ভাবনা। পৃথিবীতে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও ধর্মগুরুর মধ্যে আনুগত্য ও ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। এবং তার ফলে বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষিত হলেও এর পুনরভ্যুত্থান পুনরায় সেই অশুভ সঙ্ঘর্ষের সূচনা করছে।

বিশ্ব নয়া সমাজের সভাপতি যোগীরাজ সূর্যদেব সন্ত ফতে সিং-য়ের দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা অনশন শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সন্তজীর দাবি মেনে নিতে স্বীকৃত না হন, এবং হরিয়ানা সম্পর্কে আর কোন পুনর্বিবেচনা না হয়, সেই দাবিতে তিনিও অনশন শুরু করেছেন।

এ ধরনের জুলুম করে দাবি আদায় করার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিপদ এই যে, সেখানে বহুজনকে খুশি রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বহুজনকে খুশি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে সরকারী নীতি গৃহীত হয়, তাতে কিছুটা দুর্বলতার প্রশ্রয় থাকে। অনশন, হিংসাত্মক কার্যানুষ্ঠানের হুমকি প্রভৃতি 'ব্ল্যাকমেইল'-এর রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁরা এ যাবৎ কাল অনুসৃত সরকারী নীতির দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন। আজ যে দেশের এখানে সেখানে বিভিন্ন ব্যাপারে অনশনের হিড়িক দেখা যায়, তার জন্য এই সরকারী দুর্বলতাই দায়ী। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই দুর্বলতা চিরতরে দূর করার জন্য সঙ্কল্প বদ্ধ হয়ে থেকে যদি সেটা কার্যে পরিণত করতে পারেন, তাহলে বাস্তবিকই এ একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে।

অনশনব্রতী ধর্মগুরুদের নিকট আমাদের এই সবিনয় প্রশ্ন স্বভাবতঃই করতে ইচ্ছা করে যে, মানব জাতির সম্মুখে আজ যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে, তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে, নিছক রাজনৈতিক বিতর্ক বিষয়ের মধ্যে তাঁরা কেন নিজেদের ব্যাপৃত করে ফেলছেন! মানব-জাতির কল্যাণে ও বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের কর্মধারার পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

রঙ্গ জগৎ

চাল না পাই দুঃখ নেই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও টেষ্ট ম্যাচের একটা টিকিট যোগাড় করতে পারলাম না।

জীবন

শ্রীতারাপদ দাশ

অনন্ত জীবন-পথে চলেছে মানব-যাত্রী—,
নাহি শ্রম, নাহি শ্রান্তি,
নাহি দৈন্য, নাহি ক্লান্তি,
শুধু চলা আর চলা
কাটিছে দিবস রাত্রি।

লক্ষ্যহীন অনিমেষ, জানে না বিরতি কোথা—
কতো রূপ, আলোছায়া,
বাধা পশ্চাতের মায়া,
কোন্ সম্মুখের বাণী
টানে তারে হেথা-হোথা ?

জন্ম-মৃত্যু অন্ধকারে হারায়েছে বারে-বারে—
ভাঙ্গা-গড়া মাঝে মাঝে
সাজায়েছে কতো সাজে
হারায়ে হারায়ে পুনঃ
লভিয়াছে আপনারে।

আনন্দ-অমৃতে পূর্ণ বিশ্ব জীবনের রেখা—,
অখণ্ড এ বিশ্বলোকে,
জ্বলিয়া রহিবে সুখে,
সত্যের মহিমা গীতি
অনির্বাণ দীপশিখা।

ভূষণ্ডীর ক্ষত ঝরা মাঠে

শিবেন্দ্র গোস্বামী

অদ্বিতীয় বিম্বিত বেদনা,
অক্ষম ধমনী বেয়ে প্রতিধ্বনি তোলে—
শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ের হতাশার কোলে
সঞ্চয় করে না কিছু, আগ্নেয় অনলে
একা একা দগ্ধ হয়, নেই তা' অজানা।

ময়ূরের রঙীন পেখমে—
আমি দেখি অতলান্ত সাগরের ছবি।
বহুশত শতাব্দীর সবুজ অটবী
দেখে না শাশ্বত চোখে এ যুগের কবি
রেশমের কোমলতা দূরে যায় ক্রমে।

ভূষণ্ডীর ক্ষত ঝরা মাঠে,
ভৌতিক আলেয়া রানী এখন নাচে না,
বাস্তুহারা কলোনীর বাস্তব চেতনা
কাকলী ছাপিয়ে এক সুরের ব্যঞ্জনা
বেঁধে নিয়ে সভ্যতার সোজা পথ হাঁটে।

চৈতন্যের উষ্ণ প্রস্রবণে—
নেই আর সেই রাত, মেরুন পাখীরা
ক্লান্তির বলয়ে ভুলে গেল ডানা ঝাড়া।
দীপকের তপ্ত রাগে জৈবিক ফোয়ারা
নিস্তব্ধ করেছে ওরা সঙ্গত কারণে।

শহীদ

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

—আমি বিয়ে করতে চাই বন্যা—প্লাবন শোনাল কথা ক'টা অনেক ইতস্তত করেই। অনেকদিন থেকেই প্রতীক্ষা ক'রে আছে প্লাবন, কিন্তু বলি বলি ক'রে আজ পর্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারেনি সে বন্যাকে। তাই কথাটা ব'লে ফেলেই প্লাবন কেমন যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়ল বন্যার কাছে সেই সময়ের মত।

বন্যাকে নিরুত্তর দেখে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল প্লাবন অন্ধকার আকাশের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে। সে যেন কিছুটা মিল খুঁজে পেল বন্যার চুমকি লাগানো কালো শাড়ীখানার মধ্যে। অদূরের লাইট পোষ্টের আলোয় সোনালী চুমকিগুলো তার ঝিলমিল করছে যেন।

কিন্তু বন্যা নিরুত্তরে শুধু তাকিয়ে থাকে পা দিয়ে চাপা নরম ঘাসের দিকে। কি জবাব সে দেবে এ প্রশ্নের? বন্যা জানত, প্লাবন কি একটা যেন বলতে চায়। তাই সে কিছুটা আন্দাজও করেছিল যে, প্লাবন কি বলবে তাকে। কিন্তু সহসা এভাবে যে প্লাবন একেবারে সামনাসামনি এ-কথার অবতারণা করতে পারে, এতটা বন্যা ভাবতেও পারেনি। তাই সে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে প্লাবনকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আবার চোখ ফেরায় অন্যদিকে। মনে পড়ে যায় প্লাবনের সঙ্গে তার ফেলে আসা পুরনো দিনগুলো। প্লাবনকে তার ভাল লাগে সত্যিই। প্লাবনকে কাছে পেলে মনে সে আনন্দও পায়। প্লাবনকে দেখতে না পেলে মনটা তার খারাপও লাগে। কিন্তু তাই ব'লে প্লাবনকে একেবারে বিয়ে—এতটা ভেবে দেখেনি বন্যা এর আগে পর্যন্ত। তাই সে সহসা এর কোন জবাব খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বন্যা তার স্বভাবজাত ভঙ্গিমায় বলে—'আজ তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্লাবন, কেন বলত?'

—তোমাকে আজ আমি কিছুই লুকাব না বন্যা। ক'দিন থেকে বাড়ীতে আমার বড়ই অশান্তি দেখা দিয়েছে আমার বিয়ে নিয়ে। আমি বলেছি বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে সে আর কাউকে নয়—বলেই প্লাবন বন্যার চশমার

আবার বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলে—রাত হয়ে এল বন্যা, আমার জবাব ত এখনও পেলাম না। এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বন্যা প্লাবনের দিকে তাকিয়ে বলে—আজ ওঠ।

নিরুত্তরে দু'টো প্রাণী পথ চলে পাশাপাশি, কিন্তু যেন নিতান্ত অপরিচিতের মতই। বড় রাস্তা পার হয়ে গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে প্লাবন থেমে যায়।

বন্যা সহসা হাতটা জড়িয়ে ধরে প্লাবনের। বলে—আমায় ভুল বুঝো না প্লাবন, লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি। তুমি রাগ করো না।—বন্যার চোখ দুটো সহসা ছলছল করে জলে।

ধরা গলায় প্লাবন উত্তরে শুধু বলে,—আমায় ক্ষমা কর বন্যা, ভুলতে পারবে ত?

—ওঃ, তুমি এতো নিষ্ঠুরও হ'তে পার প্লাবন? কি বলব, যদি বুকের ভিতরটা কি হচ্ছে তা জানতে!—বলেই বন্যা চোখ রগড়ায়।

কিন্তু প্লাবন স্থির থাকতে পারে না। কালবোশেখীর ঝড়ে আজ তাকে মাতিয়ে দিয়েছে একেবারে। ভারাক্রান্ত জীবন, অভিশপ্ত বাঁচা, এসব কত কি আজ তার মনের মধ্যে ভিড় করে উদ্দাম ক'রে তুলেছে তাকে হতাশার অন্ধকারে। নিমেষে সমস্ত আলোগুলো তার চোখের সামনে যেন কারেন্ট ফেল করে হঠাৎ। আজ এই প্রথম তার নিঃসঙ্গ একা ব'লে মনে হ'ল। বলতে কি, সে যেন অনেকটা ভয় পেয়ে গেল এই চিন্তায় যে, সমস্ত অন্ধকার তার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে টুটি টিপতে আসছে। তাই কোন দিকে আর না তাকিয়ে "শুধু বিদায়" এই কথা কটা ব'লেই প্লাবন আজ ঝড়ের মত ছুটে চ'লে গেল বন্যার চোখের সামনে থেকে।

আর বন্যা? অস্ফুট স্বরে 'প্লাবন একটু ফেরো' ব'লে হাত বাড়িয়েই আবার ধীরে ধীরে সংযত হয়ে বাড়ী ফেরে।

তারপর কেটে গেছে কয়েকটা বছর। শহর ছেড়ে

বন্যাকে ভোলার চেষ্টা করে সে। ডাক্তার হিসেবে দিনের পর দিন তার প্রভাব প্রতিপত্তি যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে নাওয়া-খাওয়ার সময়ও ঠিক থাকে না তার। প্রথম প্রথম সে ভাবত আপন মনেই যে, কি লাভ তার আর বেঁচে থেকে। কিন্তু এখন ক্রমশঃ কাজের মধ্যে এমনই সে ডুবে থাকে যে, নিজের কথা ভাবার একদণ্ড অবসরও আজ তার মেলে না।

সেদিন একটা লোক এলো। মাসখানেক হল যে ইঞ্জিনিয়ারটি এসেছেন, তার অসুখের খবর পেয়ে প্লাবন যায় রোগী দেখতে। গিয়ে দেখে অসুখটা ইঞ্জিনিয়ারের নয়, তার স্ত্রীর। আর রোগটা ম্যানেঞ্জায়টিস্। তাড়াতাড়ি তাকে নার্সিং হোমে নিয়ে এসে নাড়ী ধ'রে সময়মত ওষুধ, ইঞ্জেকশন, পথ্য প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করে।

অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাওয়ায় একদিন রক্ত দেওয়ার দরকার হ'য়ে পড়ল। সহকর্মীকে দিয়ে নিজের রক্তটা মিলিয়ে নিয়ে প্লাবন যেন একটা নূতন আলো দেখতে পেল এতদিন পরে। প্লাবনের এই অপূর্ব সুযোগ,—বোধহয় এরই জন্যে তার এতদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল।

এবার আর কাল বিলম্ব না ক'রে সহকর্মীর সাহায্যে যতটা দরকার সমস্ত রক্ত নিজের দেহ থেকে আদায় ক'রে নিল প্লাবন। পরদিনই রক্ত দেওয়া হয়ে গেল।

তিনদিন পরে রোগী চোখ মেলে দেখল। চিনতে পারছে সে আত্মীয়-স্বজনদের, দুটো-একটা কথাও বলছে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে।

রাত্রি আটটার পর প্লাবন নিয়মিত রোগী দেখতে এল। রোগিণী চিনতে পারল প্লাবনকে। বলল—'তুমি!'—বলেই সে আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।

টলতে টলতে প্লাবন কোনরকমে নিজের ঘরে ফিরে গেল। অন্য এক সহকর্মীকে তখনই সাত নম্বর বেডের রোগিণীকে এটেণ্ড করতে বলল। তারপর কিছুক্ষণ পরে খবর নিয়ে জানল, জ্ঞান এসেছে। এক ঘণ্টা পরে আবার শুনল, ভাল আছে। পরদিন সকাল বেলায় অবস্থা বেশ ভালর দিকে গেল।

আর নয়। এতদিন জীবনটা যে ব্যর্থ ব'লে মনে হচ্ছিল প্লাবনের, আজ তার মধ্যে সে অনেকখানি সার্থকতা খুঁজে পেল। সেদিন যে আলোগুলো সহসা নিভে গিয়েছিল তার চোখের সামনে থেকে, আজ যেন সেগুলো আবার একসঙ্গে জ্বলে উঠল তার চারদিকে।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্লাবন সেইদিনই দুর্গাপুর ছেড়ে আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

আতাবনে

শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার

(সেদিন) যখন বসেছিলেম আতাবনে,
কত আকুল মুকুল ফুটেছিল;
উদাস কোকিল ডেকেছিল
আর শুক্নো পাতা ঝরেছিল;
—আনমনে সেই আতাবনে।

ঘন ছায়ার মাঝে আতার বনে
গান গুঞ্জরিল আমার মনে;
সোনাঝরা নীল আকাশ ছায়ে
আলো ঝিলমিল উতল বায়ে;
—মধুপুরে সেই আতাবনে।

উদাসী মন স্বপ্ন বোনে,
নিরজনে সবুজ-বনের কোণে;
চমকি' উঠি ক্ষণে ক্ষণে
ব্যাকুল অলির গুঞ্জরণে;
—মধুঝরা সেই আতাবনে।

মুহূর্তের জন্যে

সংস্মিতা

কলকাতার রাস্তায় বাস্তবিকই পরিবহন একটা বিরাট সমস্যা স্বরূপ। এমনিতেই রাস্তায় পথ চলা দায়; তারপর ট্রামে-বাসে একটু স্থান পাওয়া বা হাতের কাছে সময়মত একটা ট্যাক্সি পাওয়া—সে ত ভাগ্যের কথা! ট্রামে-বাসে পা রাখার মত একটু জায়গা নিয়ে ছোট বড় কত ঘটনা বা দুর্ঘটনা যে ঘটে যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে!

সাধারণের যানবাহন ট্রাম-বাসের উপর অধিকাংশ লোকই একান্ত নির্ভরশীল। এর বাদুড়-ঝোলা ভিড় আমাদের চোখ-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু এইসব যান-বাহনের যখন ধর্মঘট শুরু হয়, তখন গোদের উপর বিষ ফোড়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়! সাম্প্রতিক কলকাতার বুকের উপর একযোগে ট্রাম ও বাস ধর্মঘট জনসাধারণকে এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে এনে ফেলেছে।

পরিবহন সমস্যার তীব্রতার জন্য অনেকটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দায়ী। যাত্রী সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কর্পোরেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। যত বেশী সংখ্যক বাস চলবে, লোকসানের অঙ্ক ততই বাড়বে—অর্থনীতির এ অদ্ভুত যুক্তি কর্পোরেশন দেখিয়ে থাকেন। তাই তাঁরা যতটা সম্ভব কম বাস চালিয়ে লোকসানের হার কমিয়ে আর সমানুপাতিক হারে যাত্রীদের দুর্দশার একশেষ করছেন। ষ্টেট বাস কর্তৃপক্ষ যদি জানিয়ে দেন কোন্ রুটে কত মিনিট অন্তর বাস চলছে, তা হলেই বোঝা যাবে যত বাস রাস্তায় চলছে বলে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন দাবি করছেন, তা সত্যি নয়। কারণ তা হলে দেখা যাবে যে, যতক্ষণে তিনটি বাসের চলবার কথা ততক্ষণে একটি বাসও চলেনি।

ষ্টেট বাসের অনুকল্প হিসাবে কলকাতায় কিছু প্রাইভেট বাস চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ষ্টেট ট্রান্স-পোর্ট কর্পোরেশন আর বেশী প্রাইভেট বাস চালাতে দিতে চাইছেন না বলে জানা গেছে। কর্পোরেশন আশঙ্কা করছে যে, তা হলে তাদের লোকসানের বহর আরও বেড়ে যাবে।

কর্পোরেশন নিজেরা বেশী বাস চালাচ্ছেন না, বেশী প্রাইভেট বাস চালাতেও আপত্তি জানাবেন, আবার ওদিকে ট্রাম ধর্মঘট—এখন জনসাধারণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

*　　*　　*

প্রবাদ আছে, 'বিধি যখন বাম হয়—'; আমাদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে (Struggle for existence) সকলের নাভিশ্বাস উঠেছে, জনসংখ্যার হার হুহু করে বেড়ে চলেছে আর মানুষের লোভ, ভণ্ডামি ও দুর্নীতি যেন চক্ষুলজ্জার মুখোশ খুলে বিকট মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবীও বিরূপ হয়ে উঠেছেন।

এমনিতেই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার অত্যন্ত স্বল্প। তার উপর এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খরা দেখা দিয়েছে। এতে বহু শস্য হানি হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে এ বৎসরে ফলনের হারও অত্যন্ত স্বল্প।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে স্বভাবতঃই দেশে সরবরাহে ঘাটতি হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সেই সুযোগে অনেকেই বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য এতে সাধারণের দুর্দশা আরও চরমে উঠবে।

আমাদের চাল-গমের চাহিদার বেশীর ভাগ বিদেশী সরবরাহের দ্বারা মেটান হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় চরিত্র যদি এরূপ সততাবর্জিত হয়, তা'হলে আমাদের সম্মুখবর্তী এ কঠিন সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সুদূর-পরাহত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপুল চাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি প্রভৃতি সমস্যা আমাদের নিকট একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

SADHANA DASAN
PURE AYURVEDIC TOOTH POWDER

আদর্শ দন্তমঞ্জন

সাধনা ঔষধালয় — ঢাকা
১০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর
কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ — শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন)
এম্. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র — ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য।

যা হারায় না

(গল্প)

শ্রীঅজিত রায়

ছোটবেলা থেকেই দুজনের আলাপ। যেত একসঙ্গে ফুটবল মাঠে। একজন ছিল ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক, অন্যজন মোহনবাগানের। লাইন দিয়ে টিকিট কিনে ঢুকতে হ'ত না—মেম্বারশিপ কার্ড যোগাড় করেছিল তারা। ইষ্ট-বেঙ্গলের তখন দুর্ধর্ষ টিম—পাঁচটি ফরওয়ার্ড যেন পাঁচটি বাঘ ছোটে যখন বল নিয়ে, আটকায় কার সাধ্যি! একজন অপরজনকে পাশ দেয়, সে কাটিয়ে কাটিয়ে নিয়ে বল পেনাল্টী সীমানার মধ্যে ফেলে, সেন্টার ফরওয়ার্ড কিংবা লেফট্ ইন্ লাফিয়ে পড়ে—তারপরে বাঁ পায়ের তীব্র শট, আর বল যেন নেট ছিঁড়ে দেয়। এমনি করে গোল হয়, আর গ্যালারীতে সমর্থকদের জয়োল্লাস যেন দশ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। যখনই ইষ্টবেঙ্গলের গোল হয় তপতী লাফাতে আরম্ভ করে, আর মন্মথ যায় চুপ করে। তপতী লাফাতে লাফাতে বাড়ী আসে আর শুরু করে খেলার গল্প। মন্মথ নিজের বাড়ী গিয়ে খাটের উপর চুপ করে শুয়ে থাকে। প্রতি সপ্তাহে একবার কি দু'বার খেলা দেখতে যায় ওরা। এমনি করে লীগের খেলা শেষ হ'ল। ইষ্টবেঙ্গল লীগ বিজয়ী হ'ল—তপতীর আনন্দ দেখে কে!

কিন্তু শুধু খেলা দেখা নয়। সকাল সাতটায় উঠে মন্মথ তার ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করে। কামানো শেষ হ'লে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নেয়। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ করেছে। এ যুদ্ধের জন্য কারা দোষী! ভাবছিল মন্মথ। এই সময় তপতী একবার আসে। Economics-এর দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—Duopolyতে value কি করে স্থির হয়, Monopoly আর Imperfect competition-এ তফাত কি? এইভাবে অর্থনীতি ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। তার সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হয় তাদেরই যারা অধ্যাপনায় রত। তবু মন্মথ যতটুকু পারে বোঝায়।

তপতী টিপ্পনী কাটে—এরকম করে দাড়ি কামিয়েছ কেন তুমি? এখনও খসখস করছে!

মন্মথ কোন উত্তর দেয় না।

—আজ কলেজ যাবে না? তপতী প্রশ্ন করে।

—হুঁ, যাব। বলে মন্মথ খবরের কাগজের লেখাগুলো দেখে।

—ওমা, নটা যে বাজল। কখন স্নান করতে উঠবে? —আবার জিজ্ঞাসা করে তপতী।

—উঠব 'খন—গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় মন্মথ।

তারপর তপতীর সঙ্গে দুটো চারটে কথা হয়। Vietnam war-এ কারা দোষী! 'আমেরিকা'—সবলে উত্তর দেয় তপতী।

তারপর তপতী চলে যায়। স্নান খাওয়া সেরে যখন কলেজে রওনা হয় মন্মথ, তখন বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কোনো-রকমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠাসাঠাসির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মন্মথ। কত মানুষ চতুর্দিকে। এরকম ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে যেতে তপতীর কথা মনে পড়ল মন্মথর। বেচারী কি কষ্টে কলেজে যায়। তপতীর জন্য মায়া হয় মন্মথর। শীর্ণ সুন্দরী মেয়েটি। বাবা ওর কোনো এক Office-এর কেরানী। দশটা-পাঁচটা খেটে যা সামান্য আয় করেন, তা থেকেই কোনোরকমে সংসার চলে। তপতীর একটা ভাল শাড়ী নেই—তার একটু আমোদের জন্য বাড়তি পয়সা খরচ করা তার বাবার পক্ষে সম্ভব হয় না। মন্মথর ইচ্ছে হয় ওর জন্য মাঝে মাঝে কিছু কিনে দেয়। কিন্তু তপতীর নেবার কোনো আগ্রহই নেই—তা সে যতই স্নেহের দান হোক না কেন। এমনকি কলেজে টিফিনেরও পয়সা থাকে না তপতীর।

বাসের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিজের কষ্টের মাঝেই তপতীর দুঃখ অনুভব করতে পারে মন্মথ। সাধারণ

সময়ে বেশ কড়া কড়া কথা বলে মন্মথ—'কেন মন দিয়ে পড়াশুনো কর না—একটু মন দিয়ে পড়—অত ছটফটে হওয়ার দিকে ঝোঁক কেন!' কিন্তু আজ অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল তার।

কলেজে গিয়ে কয়েকটা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর তপতীকে ডেকে নিয়ে কাছের দোকানে মন্মথ গেল। ওকে বসিয়ে চা-খাবারের অর্ডার দিল। প্রবল আপত্তি করলেও তপতীকে সেই খাবার খেতেই হ'ল। তপতী যখন খাচ্ছিল, মন্মথ তার শীর্ণ সুন্দর মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বাইরে মুঠো মুঠো রোদ....উজ্জ্বল দুপুর!

ভবিষ্যৎ জীবনের এক সুখ-স্বপ্ন নিবিড় ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মন্মথর। একদিন যখন এই সুন্দর মেয়েটি তার হবে, কত সুখের জীবন—কেমন সুন্দর সংসার হবে! বাইরে নীল আকাশের কোলে বাতাসের চাপে উড়ে বেড়ানো সাদা-কালো মেঘগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখলে ভবিষ্যতের সুখের কথাই মনে হয় মন্মথর।

তপতীর অভাবের সংসার। এই দৈন্যের মধ্যেও তপতীর কত ধৈর্য! এতটুকু গ্লানি নেই মনে। অত দারিদ্র্যের মাঝেও তার প্রশান্তি আর সুকোমল ভাব মন্মথকে অনিবার্য ভাবে আকৃষ্ট করে রাখে। তার থেকে এক Year নীচে পড়ে তপতী।

সেদিন আর ক্লাস করল না তপতী ও মন্মথ। সেই দোকানে বসে অনেকক্ষণ তারা গল্প করল দুজনে।—'না, ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিকে কোনোক্রমেই নিরপেক্ষ বলা যায় না'—এবং কেন বলা যায় না এই নিয়ে মন্মথ আরও বলল, 'ভারতে বৈদেশিক নীতির বাইরের রূপটা যাই হোক না কেন—ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি স্বাতন্ত্র্য, এবং এক ধনতান্ত্রিক দেশ, শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের রক্ষার জন্য লড়াই করবেই।'

তপতীর মনে হ'ল ওটা নিছক তত্ত্ব কথা। বাস্তবে ভারতবর্ষ সহাবস্থানের যে নীতির কথা বলে, তা যে অন্তরে গ্রহণ করেছে।

সেইদিন বিকেলের দিকে মন্মথ তপতীকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল। তপতী বাসায় এসে দেখে বাবার হঠাৎ জ্বর

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন—বাবার বিছানার একপাশে বসে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তপতী প্রথমে ব্যাপারটা সামান্য ভেবেছিল। তারপর বাবার কপালে হাত দিয়ে দেখল, গায়ে বেশ জ্বর আছে। মাকে বলল ডাক্তার ডাকার কথা। কিন্তু মায়ের কাছে যা সামান্য ছিল তা নিঃশেষ—এখন যে মাসের শেষ! যা' আছে তাতে ডাক্তারের ভিজিট-ই কুলোবে না।

তপতী নিজের টিফিনের জমানো পয়সা থেকেই ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। ছোট ভাই গেল। বেশ দেরি হ'ল তার ফিরতে। যখন ডাক্তার নিয়ে ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে গম্ভীর হলেন। তপতী উদ্বিগ্ন মুখে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করে দিলেন। বললেন—জীবনের আশঙ্কা আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এইরকম হয়েছে।

মাকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে তপতী বাবার শিয়রে বসে রইল। মাথায় হাওয়া করল, মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা দিল—সময়মত ওষুধও খাওয়াল।

পরের দিন বিকেলে আবার ডাক্তার এলেন। রোগী দেখে ওষুধ পালটে দিলেন। কিন্তু তার পরের দিনও জ্বর মোচনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কয়েক দিন তপতীর কলেজ যাওয়া বন্ধ রইল। সে আর মা পালা করে রোগীর সেবা করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে অসুখটা সামান্য বলে মনে হয়েছিল, ডাক্তারের ওষুধ ও এত সেবা যত্নেও তা আর ভাল হ'ল না—বাবা মারা গেলেন।

মা বাবার বিছানায় আছড়ে পড়লেন। তপতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের সংসার মোটেই সচ্ছল নয়। সামান্য আয়ে শত অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে। বাবার আয়ে কোনরকমে সংসার চলেছে তাদের। বাবার মৃত্যুতে সংসারের মধ্যে ভয়াবহ শোকের ছায়া নামল।

বাবার সংকার করে তারা যখন গুটিকয় প্রাণী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তখন প্রথম প্রশ্ন হ'ল, কেমন করে এবার তাদের সংসার চলবে। ছোট ভাই এখনও স্কুলে

শহরের এই বাসা—এর ভাড়াও যে অনেক! আর তপতী পড়ছিল মোটে 1st year-এ। ঐ বিদ্যে নিয়ে এ বাজারে চাকরি জোটানো কত শক্ত।

তবু তপতী তার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যেখানে পেরেছে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। উপায়ান্তর না দেখে তপতীর মা গ্রামের এক আত্মীয়ার কাছে আশ্রয় চেয়ে চিঠি লিখলেন। সেই আত্মীয়ার পরিবারে সংসারের সব কাজ তারাই করে দেবে—বিনিময়ে সামান্য আশ্রয় আর সংস্থান তারা পাবে।

আত্মীয়াটি সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন। তপতীরা শহরের বাস উঠিয়ে সেই বাসা ত্যাগ করে কলেজে নাম কাটিয়ে একদিন সন্ধ্যায় গ্রামের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে গুটিকতক তারা উঠেছিল। এই নিরাশ্রয় হতাশ পরিবারটি অলক্ষ্যে বিদায় নিল, কেউ টের পেল না।

* *

গ্রামের ধানক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সবুজ ধানের শীষগুলির উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় চমৎকার লাগছিল। পাশ দিয়ে চলে গেছে শহরে যাবার রাস্তা—বাস-লরি যাতায়াত করে সে রাস্তা দিয়ে। কিন্তু পাশেই ধানের মাঠগুলো যেন অলস হয়ে শুয়ে আছে। দু' একটা চালাঘর আছে—যারা ক্ষেত দেখাশুনো করে তাদের থাকবার আস্তানা। দূরে গ্রামের কুঁড়েগুলো দেখা যায়—খালি গায়ে মোটা কাপড় প'রে দু' চারজন মাঠের

দিকে আসছে।

তপতী বেড়াতে থাকে। দূরে দিগন্ত রেখায় আকাশ আর বিস্তৃত মাঠ মিশে গিয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে বেশ কিছু দূর গেলে যে বাঁধটা তৈরী হচ্ছে, তার তৈরীর কাজ দেখা যায়। অনেক জনমজুর খাটছে। সেই বাঁধ দিয়ে খাল কেটে মাঠে জল আসবে। চলতে চলতে তপতীর মন্মথর কথা মনে পড়ে যায়। ও এখন কি করছে? শহর থেকে চলে আসার পর কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। মন্মথকে কিছু জানায় নি। সে জানেও না তারা চলে এসেছে। হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয় আর কোনদিন দেখাও হবে না তার সঙ্গে। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি বয়ে বেড়াতে হবে। এখানে তপতী মাসিমার ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ায়—মা রান্নায় সাহায্য করেন—ছোট ভাই বাজার করে—বাড়ীর অন্যান্য কাজে সাহায্য করে। এইভাবে তাদের দিন কাটে!

১৯৬৫ সাল। মন্মথ B. A. পাস করল। নানা প্রশ্ন তার মনে আসে। পরিকল্পনা দিয়ে দেশের উন্নতি বিধানের বিভিন্ন চেষ্টা চলছে। কোন দিক থেকে আসছে বাধা, কোনো জায়গা থেকে আসছে সমালোচনা। মন্মথ অনেক ভেবে সঠিক পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত স্থির করার চেষ্টা করে। এই ছোটখাটো জলসেচ পরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা—ছাড়া ছাড়া ভারি শিল্প তৈরী করা—এর মধ্যে কোথাও যেন ভাল ভাবে সংগঠনমূলক প্রয়াস নেই। ওতে উন্নতি হবার আশা কতটুকু? এ বিষয়ে আলোচনা চালাবার মত উপযুক্ত সঙ্গী সে খুঁজে পায় না।

বহুদিন হ'ল তপতীরা বাসা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। হঠাৎ তাদের চলে যাবার কি কারণ ঘটল? যাবার আগে মন্মথকে কিছু জানালও না পর্যন্ত। নিশুতি রাতে ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আকাশের মিটি-মিটি তারাগুলো দেখতে দেখতে তপতীর কথা মনে পড়ে মন্মথর। জীবনে যারা আসে তারা কত সহজে আর বিনা দ্বিধায় চলে যায়। ও কোথায় গেল, কেন গেল—খোঁজ নিয়েও জানতে পারল না মন্মথ।

মন্মথ চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। এতদিন পরে এই স্থান ত্যাগ করে বাইরে গিয়ে নতুন করে ঘর পাতা অনেক অসুবিধার। তবু উৎসাহ আছে মন্মথর মনে। এমনি ছুটে চলাই তো জীবন! দূর থেকে দূরে চলা—বন্ধনহীন এ যাওয়ার যেন কোনো শেষ নেই। কাজের জায়গায় এসে একটা Quarter-ও পেল মন্মথ।

ছোট ছোট তিনখানা ঘর। সামনে একফালি একটা বারান্দা। বাড়ীতে ঢোকার মুখে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট বাগান। সেখানে নানা ধরনের ফুল ফুটে থাকে। বারান্দায় চেয়ার পেতে সামনের খোলা প্রশস্ত মাঠের দিকে চেয়ে থাকে মন্মথ। মাঠের ঘাসে উজ্জ্বল রোদ পড়ে ঝিকিমিকি করছে। সব যেন কেমন ঔদাসীন্যে ভরা। কেমন প্রচ্ছন্ন বিষাদে মগ্ন। হাসি পায় মন্মথর। কেন—গেলই বা একজন। জীবনে এমনি কতজন আসে আর যায়, হাসে আর চায়—পশ্চাতে ফিরে তাকাবার অবসরই নেই। ঘর বাঁধবার আশা নাই-বা মিটল!

কে একজন এসেছে দেখা করতে। মন্মথ বাইরে এল। প্রথমেই আগন্তুকের পায়ের দিকে নজর পড়ল। জুতো নেই, খালি পা।

—একটা চাকরি যদি আমায় যোগাড় করে দেন.......

মন্মথ এবার আগন্তুকের মুখের পানে তাকায়—এ যে তপতী! প্রায় সেই রকমই আছে, তবু একটু যেন মলিন হয়ে গেছে। চুপ করে থাকে মন্মথ। মুখের রেখায় আশা-আনন্দের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তপতীকে বসিয়ে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে মন্মথ। সব শুনে নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মন্মথ। আনন্দে নেচে ওঠে ওর মন।

তপতী বলে—তবে যাই এখন।

না, যেতে দেওয়া আর সম্ভব নয় ওকে। মন্মথ ভাবে, আবার ও হারিয়ে যাবে। তপতীর হাতটা ধরে বলে—না, এখানে বসো।

কলকাতায় গিয়ে আবার খেলা দেখে ওরা। মোহন-বাগান হারিয়ে দিল ইষ্টবেঙ্গলকে। আনন্দে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা বসে যায় মন্মথর। তপতী চুপ করে থাকে। আবার দুজনে দুজনের কাছে এসেছে—আর কিছুই তাদের মধ্যে ব্যবধান আনতে পারবে না।

ক্ষণিকের অতিথি

(গল্প)

শ্রীনিরঞ্জন সেন

একবার—দু'বার—তিনবার—আরও একবার দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।

—কে ?—ভেতর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে আসে।

—আমি—পুরুষ-কণ্ঠ উত্তর ছুঁড়ে দেয় দরজার এপাশ থেকে।

—আমি কে ? আমি বলতে কি বুঝব—পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় স্ত্রী-কণ্ঠ।

এ পক্ষ এবার নীরব।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দরজা খুলতে তবুও যেন ভরসা পায় না রেবা। দরজা খুলে দিয়ে যাকে দেখল, তাতে দু'পা পিছিয়ে এসে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে টাল সামলে নিল রেবা। মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শূন্যতার ঝংকার শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটা কাঁপছে। ভূমিকম্প হচ্ছে—চুরমার হয়ে যাবে সৃষ্টি। এ তারই সঙ্কেত।

—তুমি ?—রেবার কণ্ঠে অর্থহীন প্রশ্ন।

উত্তর আসে না—ও পক্ষ নীরব। তাই এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে রেবা—কি মনে করে এখানে ?

—রেবা—উত্তরের পরিবর্তে শ্রীমন্তর ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

—তোমার পাপ মুখে এ নাম আর উচ্চারণ করো না শ্রীমন্ত—তুমি যাও। তোমার ছায়া এ বাড়ীতে লাগলে অকল্যাণ হবে!

পাণ্ডুর-শীর্ণ শ্রীমন্তর মুখখানিতে মুহূর্তে ঝলসে ওঠে বাঁকা হাসি। বলে—অপূর্ব কথা শোনালে রেবা—সত্যি তুমি দরদী! তা না হলে তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এমন কথা! অদ্ভুত তুমি! একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শ্রীমন্ত।—আরও কিছু বল রেবা—থামলে কেন ? স্বচ্ছন্দে বলতে পার। কেননা বিবেক বলে তোমার কিছুই নেই। তবুও আমি ক্ষণিকের জন্যে আশ্রয় চাই—আমি তোমার অতিথি,—অনুনয় ফুটে ওঠে শ্রীমন্তের কণ্ঠে।

—না, না শ্রীমন্ত, তুমি যাও এখান থেকে। লজ্জা-সংকোচ কি তোমার কিছুই নেই—বলে রেবা চলে যাচ্ছিল।

—রেবা শোন।

ফিরে দাঁড়ায় রেবা।

—চলে যাব আমি—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শ্রীমন্ত। তারপরে একটা খাম বের করে জামার পকেট থেকে। তার ভেতর থেকে রেবার একখানা আবক্ষ ফটো বের করে ওর সামনে ধরে।

পৃথিবী রং বদলায়—আচমকাই।

—দশ বছর আগের—অন্যমনস্ক ভাবে উচ্চারণ করে রেবা।

—কত রঙীন স্বপ্নময় সন্ধ্যা—আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে শ্রীমন্ত।

তখনকার রেবার সঙ্গে এখনকার রেবার এতটুকুও মিল নেই। দু'চোখ জলে ভরে যায় রেবার। তখনকার শ্রীমন্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অতীতের অনুভূতিতে ব্যাকুল করা পরিবেশ। দশটি বছর! অতীতের উজ্জ্বল আভা এখনও ওদের মনের পাতায় পাতায় আঁকা রয়েছে! এই জন্যেই অল্পেই বিদায় করে দিচ্ছিল রেবা। নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। কিন্তু নিষ্কৃতি এত সহজে পাওয়া যায় না।

—রেবা! আজকের দিনটা থাকতে দাও। মনে কর আমি তোমার হারানো অতিথি—অনুনয়ে ভরা শ্রীমন্তের প্রার্থনা।

—তুমি যাও শ্রীমন্ত, অর্থহীন তোমার প্রার্থনা। তুমি একটি অপদার্থ, তা' না হলে পালিয়ে যাও আমাকে ফেলে রেখে! যাও, আমার নিদ্রিত স্মৃতিকে আর জাগিও না।

—শুধু আজকের দিনটা—এই আমার অনুরোধ—শেষ অনুরোধ। আর কি জান রেবা!

—কি ?

—না খাইয়ে আমাকে বিদায় করে দেবে, আজ তিন

দিন কিছুই খাইনি জল ছাড়া—ধরা পড়ে যাবার ভয়ে—

সত্যি এবার রেবার নারী মনে মায়ার স্পন্দন জাগে। অতীতের অস্তিত্ব যেন পরিবেশকে সহজ করে দিল। নিঃশেষে হারিয়ে গেল রেবার মন অতীতের স্মৃতির ঘরে।

—তুমি আজ তিন দিন উপোসী?—রেবার দু'চোখে মায়ার দীপ্তি। ওর সামনে ওরই মনের মানুষ, যাকে ভালবেসে ছিল রেবা। নিঃস্ব পথিক আজ সেই শ্রীমন্ত!

—এখানে এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—রেবা এগিয়ে এসে শ্রীমন্তর হাত ধরে। অতীতের স্বীকৃতি! এগিয়ে যায় শ্রীমন্ত। উপস্থিত এই নিরাপদ আশ্রয়। সান্ত্বনাও বটে। অতীতের দুর্বার আকর্ষণ দু'টি মনে!

আশ্চর্য! এই হচ্ছে নারী মন। দূরে সরিয়ে দেয় প্রয়োজন হলে—আবার প্রয়োজন হলে কাছেও টানে! এতক্ষণে ভাল করে রেবাকে লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত।

—রেবা! তোমার পরনে থান!

—আমি বিধবা শ্রীমন্ত! নির্মম নিয়তির চক্রের তলায় কে কখন পড়ে তা বোঝা যায় না।

—এই বুঝি তোমার স্বামীর ঘর?

—হ্যাঁ।

রেবা—রেবা বিশ্বাস! কি মিষ্টি চেহারা ছিল—আজ আর কিছুই নেই। যৌবন চলে গেছে। কি ছিল আর কি হয়েছে।

কথা হারা কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়।

—আমার ঠিকানা........

রেবার কথা শেষ হবার আগেই উত্তর দেয় শ্রীমন্ত—তোমার পিসিমার কাছ থেকে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।

অনুশোচনার আঘাতে জর্জরিত রেবার মন। সাদা থানের আবরণে ঢাকা একটি নারী মূর্তি। যৌবন যাবার সময় নয়, তবুও গেছে।

—বস।—আসন পেতে দেয় রেবা। প্রশান্তি ঘেরা এই ঠাঁই।

সবুজ স্বপ্ন ভরা পরিবেশ। একটু পরে রেবা নিজের কাজে চলে যায়। রেবার খুশিতে উজ্জ্বল চোখ দু'টিতে কি আশ্বাসের আভাস। অতীতের স্মৃতি ছড়ানো ঠাঁই।

ঘরের ভেতর গিয়ে পড়ে শ্রীমন্তর দৃষ্টি। একটি

ফুলের আস্তরণ। ধন কামনায়, স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনায় চিরন্তনী নারীর ভক্তি অর্ঘ্য। পূত পবিত্র পরিবেশ ঘরটির। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রেবা। মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের মিস্ট্রেস সে। তাছাড়া টিউশনিও আছে।

ওঃ, এই সেই রেবা—যার একটু সান্নিধ্য পেলে ধন্য হয়ে যেত যে কোন যুবক! তাদের ঘরের আবহাওয়া ছিল আভিজাত্য ধর্মী। রেবার বাবা ছিল গণ্যমান্য ব্যক্তি—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। রেবার জীবন ছিল সহজ-সুন্দর। উদ্‌গত অশ্রু গোপন করে শ্রীমন্ত। অদৃষ্ট! অদৃষ্টের রহস্য বোঝা বড্ড শক্ত—আসলে বোঝাই যায় না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বসে আছে শ্রীমন্ত। রেবাও। অতি সন্তর্পণে চাইল রেবা শ্রীমন্তর দিকে। রেবার সিঁথি সিঁদুর-রাঙা নয়—সিঁদুর মুছে গেছে। যে সিঁদুর নারী জীবনের চরম সার্থকতা।

—মা!—একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এলো বই খাতা নিয়ে।

—এস বাবা! সোহাগ-ভরা ডাক রেবার কণ্ঠে। একরাশ কালো চুল ছেলেটির মাথায়—সুশ্রী মুখ তার। ডাগর দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

—হাউ বিউটিফুল বয়!—শ্রীমন্ত বলে ফেলে।

—ও আমার ছেলে শ্রীমন্ত। ও হবার পরেই ওর বাবা মারা যান। গৌতম ওর নাম।

—গৌতম!

—হ্যাঁ, গৌতম—রেবার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে গেল।

—মনে পড়ে রেবা—

রেবা চমকে ওঠে।

—পড়ে! তোমার দেওয়া নামই রেখেছি শ্রীমন্ত—অতীতের আশীর্বাদ।

—কথা ছিল, আমাদের ছেলে হলে তার নাম রাখব গৌতম, আর মেয়ে হলে গোপা।

—শ্রীমন্ত, যেচেই আমি তোমার প্রেমে পড়ি। ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখেছিলাম দু'জনে, কিন্তু সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি।

—রেবা তবুও আমি পেয়েছিলাম একটি নারী, আর তার ভালবাসা। সহজ-সুন্দর প্রেরণাময়ী একটি নারী।

জাগানো, যৌবনের তৃষ্ণা জাগানো। আমার মরু-জীবনে তুমি ছিলে মরূদ্যান। কিন্তু সব ভুল রেবা। এখন তোমার বাড়ীতে এসেছি অতিথিরূপে। তুমি এখন নিরপেক্ষ। আচ্ছা রেবা, এখন আর ঘর বাঁধা যায় না? বলে ফেলে শ্রীমন্ত নিজের অগোচরে!

শিউরে ওঠে রেবা। তার পরেই কঠিন কণ্ঠে বলে—না, তবে তোমার বক্তব্য আমি সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—না-না রেবা, বক্তব্য আমার কিছু নেই। কোনদিন থাকেনি, আজও নেই। তাছাড়া আমি চলে যাব একটু পরে—একটু বসি এই আর কি। এমন বলিষ্ঠ ভালবাসার আশ্রয় কিছুক্ষণের অতিথি। ঊষর মরুর মত আমার জীবন।

রেবার চোখের পাতা দু'টো ততক্ষণে জলে ভারি হয়ে গেছে।

—রেবা আমার অসহায় ভাব তোমার ভাল লেগেছিল—এই ভাল লাগা রূপান্তরিত হয়েছিল ভালবাসায়। ভালবাসা—ছোট্ট করে হাসে শ্রীমন্ত।

—তোমার শিক্ষাদীক্ষার কাছে আমি ছিলাম সামান্য মৃন্ময় পাত্র, কাজেই আমার পক্ষে তোমাকে পাওয়ার আশা ছিল সুদূর পরাহত। তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছি—তবুও তোমাকে দেখে হাসতাম। তুমিই বলেছিলে—আমাকে দেখে তুমি কেবল হাসবে শ্রীমন্ত—তোমার হাসি অদ্ভুত মিষ্টি। তোমাকে হারানোর সম্ভাবনা যেদিন বুঝতে পারি সেই দিন-ই বেরিয়ে পড়ি পথে—একটানা বিসর্পিল পথ। ভেবেছিলাম, তোমাকে ভুলে যাব—কিন্তু ভাবা যত সহজ ভোলা তত সহজ ছিল না।

—দিনের পর দিন এমনি চলে যাচ্ছিল। মদ খেতে শিখি—মদ আর মদ। নেশায় চুর হয়ে থাকতাম। টাকা। টাকার বড্ডো দরকার হতে লাগল। শেষে চুরি করতে শুরু করি।

—তুমি চোর শ্রীমন্ত!—রেবার কণ্ঠে বিস্ময়—চোখে জল।

—চুরি সমানে করে চলেছি—এই আমার নিয়তির নির্দেশ। আমার নিয়তি। একদিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ি হাতেনাতে—তারই ফলে ৬ মাস শ্রীঘরে বাস করতে হল। ৬ মাস পরে ছাড়া পেলাম। আবার সেই বিগত জীবন। মদ আর চুরি।

রেবার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে তার জল। শ্রীমন্ত বলে চলেছে নিজের কাহিনী। দূরত্ব বাঁচিয়ে বসেছে রেবা।

—রেবা, আজও পুলিশে আমাকে তাড়া করছে ধরবে বলে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম, কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

রেবা ভয়ে কাঁপতে থাকে।

—ভয় নেই রেবা, তোমার কোন বিপদ হবে না। আমি চলে যাব আঁধার নামলে।

—না, তোমার আর যাওয়া হবে না এই বিপদের মধ্যে—রেবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনায়। রেবার উদাস-দীঘল চোখে শ্রাবণ-নদীর বন্যা নামে।

—না রেবা, তা হয় না—ম্লান মুখে হাসি টেনে বলে শ্রীমন্ত।

—এই দেখ, সন্ধ্যা হয়ে গেল। তোমার চা নিয়ে আসি—বলে রেবা উঠে পড়ে। উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে শ্রীমন্ত।

সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে।

উঠে পড়ে শ্রীমন্ত। অতীতের স্মৃতির সুরের সুষমা মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে।

রেবা চা নিয়ে এসে দেখে শ্রীমন্ত নেই।

—শ্রীমন্ত!

রেবার হাত থেকে ডিস সমেত কাপটা পড়ে যায়। সারা মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে ভাঙ্গা কাপ-ডিসের টুকরোগুলো।

পাশের ঘর থেকে গৌতম ছুটে আসে।

—মা! মামা·······

—মামা চলে গেছে বাবা।

—কেন মা? সরল-সহজ প্রশ্ন জাগে শিশুকণ্ঠে।

এই কেনর কি উত্তর দেবে তাই ভাবছে রেবা—ভাবছে—শুধু ভাবছে।

———

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

(গল্প)

সুদত্ত

বৃষ্টিতে কাক-ভেজা হ'য়ে নিউ হোষ্টেলের দোতলায় উঠলাম। ছ'-নম্বর ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই ভেজান দরজাটা কোনরকম আর্তনাদ না করেই সাদর আহ্বান জানাল আমায়। আমি গিয়েছিলাম শুভেন্দুবিকাশের খোঁজে। শুভেন্দু ছিল না, কোথায় গিয়েছে কে জানে! ঘরের মধ্যে কেবল রবি ছিল। ইংরাজীতে যাকে বলে ইন্টিমেট্ ফ্রেণ্ড, রবি আমার সেই-রকম বন্ধু। তবে ওর সঙ্গে পরিচয়টা আমার অল্প দিনের। বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে বুকের তলায় বালিশ গুঁজে আকাশ ভাঙা বৃষ্টির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল ও। বৃষ্টি দেখছিল। বুঝি না বর্ষাকালকে কবিরা কেন সুন্দর বলেছেন। আমার কাছে বর্ষাকালটা একটা অভিশাপ আর বিষাদাচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীরাধিকাকে বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। তবুও বৈষ্ণব কবিরা বার বার বর্ষাভিসারের ছবি এঁকেছেন বিনা দ্বিধায়। তবে তাঁদের চোখে কল্পনার রঙিন চশমা ছিল। কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবিদের কথাই বলছি কেন, বাংলাদেশের প্রায় সব কবিরাই তো বর্ষার নামে আহা-উহু করেন। তবে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, বর্ষার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। আমার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো রবি। বিছানার উপর উঠে বললো আমায় দেখে।

প্রশ্ন করলাম ওকে—আর সব কোথায়?

—রূপ কথায় 'গাইড' দেখতে গেছে।

—তুমি যাওনি কেন?

—হিন্দী বই আমার ভাল লাগে না। আরে, তুমি যে একেবারে ভিজে গিয়েছ।—আমার দিকে ভাল করে তাকাল ও।

—ভিজতে কিন্তু বেশ মজা লাগছিল।

—তা আর লাগবে না, তোমরা যে লেখক। আমার

ব্যঙ্গ করল ও।

—তুমিও তো বাবা বৃষ্টির প্রেমে মজে গিয়েছিলে।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তুমি প্যাণ্ট-জামাগুলো খুলে ফেলো। নাও, এই লুঙ্গিটা পড়ে নাও। আমার দিকে একটা লুঙ্গি এগিয়ে দিলো ও।

জামা-প্যাণ্ট খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে দিলাম। লুঙ্গিটা পরে নিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম ওর বিছানায়।

রবি জিজ্ঞাসা করল, কি খাবে, চা না কফি?

নিস্পৃহ ভাবে উত্তর দিলাম, গরম কিছু একটা হলেই হ'লো।

রবি নেমে গেল একতলায়। একতলায় ওদের ডাইনিং হল। ডাইনিং হলেই একটা ক্যান্টিন খুলেছে ঠাকুর-চাকররা মিলে। আমি আস্তে আস্তে চৌকি থেকে নেমে পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম। রেলিং ধরে দাঁড়ালাম ঝুল বারান্দার এক কোণে। বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে। বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটাগুলোকে মনে হচ্ছিল শরতের শিউলি। একটি একটি করে ঝরে যাচ্ছে। আশ্রয় নিচ্ছে মাটির কোলে। হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু। নীচের উঠানে সাজানো দেশী বিদেশী ফুলের গাছ। হোষ্টেলের সুপারিন্টেনডেণ্ট সুকুমার চৌধুরী বড় শখ করে বাগানটা তৈরী করেছেন। ভদ্রলোক নিঃসন্তান, স্ত্রীর সান্নিধ্যও পান না সব সময়। তাই তিনি খেয়ালী, বড় বেশী খেয়ালী। কাঁধে একটা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে স্থান-কাল সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলাম। রবি কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। রসিকতা করলো ও, এই না হলে লেখক! এই জন্যেই তো মেয়েরা তোমাকে পছন্দ করে।

কপট রাগে চোখ রাঙালাম আমি। রবি হাত জোড় করে মাপ চাইলো। ওর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি দেখে হেসে

ফেললাম আমি। ও-ও হেসে উঠলো জোরে।

গলা জড়াজড়ি করে ঘরে ঢুকলাম দুজনে। দরজাটা ভেজিয়ে দিল ও। কফি খেলাম আমরা। সিগারেটে ছোট ছোট টান দিয়ে বাদলা বিকেলটাকে উপভোগ করতে লাগলাম। বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের দিকে চোখের দৃষ্টিটাকে ছুঁড়ে দিয়ে রবি ধোঁয়ার রিং করতে লাগলো। আমি কোন কথা বলছিলাম না। পাছে নীরবতার মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যায়। রবিও চুপ করে বসেছিল। আমি ওর টেবিল থেকে রাজা ও রানী বইটা নিয়ে এলোমেলো ভাবে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রবি বললো, একটা গল্প শুনবে শোভন? না, গল্প নয় জীবন কাহিনী, শুনবে?

ওর কথায় অবাক হলাম আমি। ওকে আজ সম্পূর্ণ অচেনা মনে হ'লো। আমি বললাম, বলো না। বৃষ্টি-ঝরা বিকেলটার একঘেয়েমি কিছুটা কাটবে।

—তোমাকে আমি বলব। তুমি লেখক, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমার মনের ব্যথাটা। তুমি হয়তো একটা গল্পই লিখে ফেলবে এটা নিয়ে। গল্প লেখ, আপত্তি নেই; কিন্তু দেখ, রোম্যাণ্টিক প্রেম-কাহিনী লিখে ফেল না। তোমার তো সব গল্পই রোম্যাণ্টিক কমেডি; আমার কাহিনীটা কিন্তু ট্র্যাজেডি। যদি শুনতে চাও তো বলতে পারি।

—বলোই না, বলছি তো শুনবো।

আবার একটা সিগারেট ধরালো রবি। শুরু ক'রলো ওর গল্প।

আমরা বড়লোক নই, আবার গরীবও নই। বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায় আমাদের স্থান ঠিক সেই পর্যায়ে। একান্নবর্তী পরিবারে নিতান্ত অবহেলায় মানুষ হয়েছি আমি। আগাছার মতো বেড়ে উঠেছি শৈশব আর কৈশোরের মধ্য দিয়ে। সংসারের কারো কাছ থেকে পাইনি স্নেহ। মা-মরা ছেলেরা কি কোনদিন স্নেহ পায়? মাকে আবছা মনে পড়ে আমার। আমায় বড় ভালবাসতেন তিনি। তিনি মারা গেলেন, আমায় একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে। মা মারা যাওয়ার পর সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। আমি সবার মধ্যে নিতান্ত দীনহীন ভাবে জীবনের অনেকগুলো দিন পার করে দিয়ে স্কুল ফাইন্যাল দিলাম আমি। পাসও করলাম। এবার সংসারের গোমরা মুখে দেখা দিল হাসির আভাস। থমথমে কালো মেঘের মাঝে যেমন ঝিলিক মারে বিদ্যুতের দ্যুতি। তবে হ্যাঁ, আমার রিক্ত জীবনে একজন এগিয়ে এসেছিল সুধার পাত্র হাতে নিয়ে। ভরিয়ে দিয়েছিল আমার সকল শূন্যতা।

আমার মরুময় জীবনের একমাত্র আকর্ষণ ছিল সীমা। আমি জীবন-মরুর বুকে পেয়েছিলাম মরুদ্যানের সন্ধান। নইলে আমি বাঁচতে পারতাম না। অর্থাৎ সবার অবহেলা আর বিদ্রূপের পসরা মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আমাকে হয়ত আত্মহত্যা করতে হ'ত। বিশ্বাস করো শোভন, মা মারা যাওয়ার পর সীমা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে ভালবাসা পাইনি আমি। পাইনি সান্ত্বনা। তাই ওকে পেয়ে বড় সুখে ছিলাম। মনের কোণে জমা হওয়া ব্যথাগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কিন্তু সুখ জীবনের কতটুকু অংশই বা জুড়ে থাকে! নীল গগনের বুকে সাত রঙা ইন্দ্রধনু বড় সুন্দর, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। শরতের সকালে ঘাসের বুকে জমা হওয়া শিশির কণাগুলো সূর্যের আলোয় হীরের মত জ্যোতি ছড়ায়। কিন্তু কতক্ষণ? সুখ যে ঐ সাত রঙ রামধনু আর ঘাসের কোলে জমা হওয়া শিশির কণার মতোই সুন্দর, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। জীবন-তৃষ্ণা উত্তপ্ত মরু-বালিতে পথ হারিয়ে ফেলে, আশার কোমল কুঁড়িটা এব ধাক্কায় বৃন্তচ্যুত হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে, স্বপ্নের মহিমায় প্রাসাদ দেখতে দেখতে মাটিতে মিশে যায়—এইতো মানুষে

জীবন! আমারও সুখের দিন ফুরিয়ে গেল।

জানো শোভন, আমি সব ভুলতে পারব। কেবল পারব না সীমার কাছ থেকে বিদায় নেবার স্মৃতিটাকে।

এখানে চ'লে আসার আগের রাতে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলাম দাওয়ায়। সবাই অকাতরে ঘুমচ্ছিল। কেবল ঘুমতে পারিনি আমি। কি করে ঘুমব? আমাকে যে মিত্তিরদের 'আদিরে তালনা' ঘাটে যেতে হবে সীমার সঙ্গে দেখা ক'রতে। ও আসবে ব'লেছে। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। শ্বাপদ পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলাম মিত্তির পাড়ার দিকে। তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে আলের পথ ধরলাম। যা অন্ধকার! চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে লাগলাম।

আশ্বিন মাস। কাঁচা পাকা আউস ধানের শিষগুলো মৃদু হাওয়ায় লুটিয়ে পড়ছিল একে অন্যের গায়ে। আমার গায়েও মাঝে মাঝে আছাড় খাচ্ছিল ধান গাছগুলো। চোরকাঁটার আঁচড়ে পা'টা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। তবুও আমার খেয়াল ছিল না। আমার অশান্ত হৃদয়-সমুদ্রে বার বার ভেসে উঠছিল সীমার অপূর্ব লাবণ্যমাখা মুখটি, আর দীঘির কাল জলের মত স্বচ্ছ টলটলে গভীর চোখ দু'টা। রাতজাগা পাখীগুলোকে সাক্ষী রেখে শান বাঁধান ঘাটের পাড়ে বুড়ো শিউলি গাছটার তলায় দাঁড়ালাম আমি। সীমা তখনো আসেনি। ওকি আসবে না? না না, তা কি করে হয়! ওতো বলেছে আসবে। দিনের আলোয় আমাদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তাই ও আসবে রাতের গভীর অন্ধকারে। আমাদের প্রণয় ছিল গুপ্ত। চোরা-বালির তলায় জলের মত। বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'ল না। সীমা এলো কাঁপতে কাঁপতে। বুঝলাম একা আসতে ভয় পেয়েছে ও। শিউলি গাছের তলায় বসলাম দু'জনে। দু'জনে অনেক কথা বললাম। যার নাম প্রেমালাপ। একটা একটা ক'রে শিউলি ঝরছিল। আর মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছিল দূরের কোন তাল গাছের মাথা থেকে। ওকে আমি আস্তে আস্তে টেনে আনলাম আমার তৃষিত বুকের মাঝে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম খেয়াল নেই। এক সময় সীমা ব'ললো, আর নয়। চলো। ওর কথায় সময় সম্বন্ধে সচেতন হ'লাম আমি। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে হাঁটতে শুরু করলাম। ওকে বাড়ীর দেউড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আমি বাড়ী ফিরে এলাম। দাওয়ায় শুয়ে পড়লাম ক্লান্ত হ'য়ে। ভরা মন নিয়ে আকাশের তারা গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়ে।

পরদিন সকালেই ট্রেন ধ'রলাম। সীমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তা। ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে আসবার সময় দেখলাম ঘরের জানলার ধারে বসে আছে সীমা। তাকিয়ে আছে রাস্তার পানে। আমাকে দেখেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ও। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি ওর সেই অশ্রুভেজা চোখ দু'টোকে আজও ভুলতে পারিনি। কত চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি সীমাকে। হয়তো কোনদিনই পারব না। তাই তখন ভাবছিলাম ওকি আমার জন্য আজও অপেক্ষা করছে!

রবির শেষ কথাগুলো কান্নার মতো শোনালো। এক ঝলক বিদ্যুতের আলো ওর মুখে এসে পড়লো। দেখলাম, ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

জীবনায়ন

(গল্প)

তিলোত্তমা দেবী

অন্ধকারে ও হাঁটছে। রেল-লাইনের বুকের ওপর দিয়ে কাঠের স্লিপারে পা রেখে রেখে নির্ভয়ে হাঁটছে প্রণব। পৌষের এ শীতের রাতে অসংকোচ পদক্ষেপে চলতে চলতে রেল দপ্তরের বহু প্রচারিত সেই বিজ্ঞাপনটার কথা ওর এখন মনে পড়ে গেল। দৈনিক পত্রিকার প্রায় অর্ধ-পৃষ্ঠা জুড়ে যে বিজ্ঞাপনটা মাঝে মাঝে ছাপা হয়ে থাকে।

....ছোট্ট একটা শহর। দুটো রেল-লাইন সে শহরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুরান্তে কোন এক অদৃশ্য বিন্দুতে মিলে গেছে। দু'জন মাঝ বয়েসী ছেলে সে লাইন ধরে গল্প করতে করতে আপন মনে চলেছে। একটা গাড়ী ওদের অন্যমনস্কতাকে সজাগ করতে করতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। ছবিটার তলায় বড় বড় হরফে লেখা, 'মাত্র ক'টা মুহূর্ত বাঁচানোর জন্যে জীবন হারানোর ঝুঁকি নেবেন না।' আজ এ হিম-ঝরা রাতে ঐ বিজ্ঞাপনের সতর্কতার কথা ভেবে মনে মনে হাসি পেল প্রণবের। ঐ বিজ্ঞাপনটা আজ প্রণবের কাছে নিতান্তই অর্থহীন। শহরের কল-কোলাহল ছেড়ে ও যে এখন নির্জন এ লাইন ধরে হাঁটছে একা একা তাতে ওর সময় বাঁচানোর তাগিদ নেই কোন। এটা ওর গন্তব্যের সংক্ষিপ্ত কোন পথও নয়। জীবন বাঁচানোর সব দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই ও আজ ছুটে এসেছে এখানে।

হিমেল উত্তুরে বাতাসটা হিমাঙ্কের শৈত্যতা নিয়ে ছুটে চলেছে। ফাঁকা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে থেকে থেকে একটা আওয়াজ তুলছে অস্ফুট। প্রণবের মনে হ'ল শীতের তীব্রতায় গলাটা এবার জমে কাঠ হয়ে আসছে। হয়তো আর কিছুক্ষণ পর অনেক চেষ্টা করলেও ও কথা বলতে পারবে না। মনের সব অব্যক্ত কথা কণ্ঠ-নালীর ছাড়পত্র না পেয়ে মনের মাঝেই মাথা কুটে গুমরে মরবে। প্রণব একটু দাঁড়ালো। পেছন ফিরে দেখতে চেষ্টা করলো রেল-ষ্টেশনটাকে। একটু আগে যেখান থেকে ও যাত্রা শুরু করেছিল। গাঢ় অন্ধকারের মৌন যবনিকার অন্তরালে ষ্টেশন বাড়ীটার অস্তিত্ব মিশেমিশে একাকার। শুধু প্ল্যাটফর্মে জ্বলে থাকা ক'টা বিজলী বাতি মিটিমিটি আলো ছড়াচ্ছে। যেন ওরা ষ্টেশনের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। আর ক'টা রক্তচক্ষু সারারাত জেগে জেগে ওদের কর্তব্য করে যাবে নিঃশব্দে। ট্রেনটা আসতে এখনও অনেক দেরি। ষ্টেশন ছেড়ে আসার আগে প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটায় ও দেখে এসেছিল ঠিক ন'টা। এটুকু পথ আসতে কত সময়ই-বা লাগতে পারে। বড় জোর দশ মিনিট। ন'টা দশ। অথচ ট্রেনটা আসবে ন'টা চল্লিশে। এমনকি দেরি হতে পারে আরও। রাতের এ শেষ ট্রেনটা মাঝে মাঝে প্রায়ই নাকি দেরি করে। অন্ততঃ এখনও চল্লিশ মিনিট! কদর্যতা আর অবিশ্বাসে ভরা এ দুনিয়ার বুকে বসে এখনও তিরিশটা মিনিট পঙ্কিলতার দূষিত বাতাস শুঁকতে হবে।

প্রতীক্ষার দৈর্ঘ্যতার কথা ভেবে প্রণব মনে মনে অধৈর্য হল। কারণ অবুঝ মনটা এখনও মাঝে মাঝে সীতার কথা ভাবতে চাইছে। অথচ আজ সীতাকেই ভুলতে চায় প্রণব। সীতার বাস্তব সব স্মৃতিকে মুছে ফেলতেই প্রণব নিজেকে মুছে ফেলতে চাইছে দুনিয়ার বুক থেকে। অথচ বিয়ের পর গত চারটে বছর সীতাই ছিল প্রণবের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার একমাত্র অংশীদার। জীবনের সব জটিলতার কথা, আশা আকাঙ্ক্ষা আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের কথা এতটুকুও গোপন করেনি প্রণব সীতার কাছে। অথচ সে সীতা আজ কোথায়!

সীতাকে প্রণব অবিশ্বাস করেনি কোনদিন। এ দুনিয়ার সব কিছুকেই প্রণব এতদিন বিশ্বাসের চোখে দেখতো। তাই পাশের বাড়ীর সুনীতের সঙ্গে সীতার স্বাচ্ছন্দ্য মেলামেশাকে ও কোনদিন দৃষ্টির অস্বচ্ছতা দিয়ে বিচার করতে বসেনি। অথচ সে বিশ্বাসের মর্যাদা ওরা রাখলো কই! ভালবাসার কিইবা মূল্য পেল প্রণব সীতার কাছ থেকে!........হঠাৎ খেয়াল হলো প্রণবের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে এক জায়গায়। ষ্টেশনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ও এতক্ষণ সীতার কথাই ভাবছে।....আবার সীতা!

সীতার কথা মনে হতে চকিতে ও ক্ষিপ্ত হল। আবার ও এগিয়ে চললো। চলার প্রতি পদক্ষেপে হত্যা করতে চাইলো সীতার সব ভাবনাগুলো। লাইনের দু'পাশে ঝোপে ঝোপে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ জোনাকি। সে আলোর রোশনাইতে নহবত ধরেছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঝিঁঝি পোকার দল, অন্ধকারে নির্দিষ্ট পথের নিশানা ধরে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ক'টা নিশাচর। ওদের পাখার আওয়াজ অন্ধকারের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে আসছে।

আসলে এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালবাসে না এক-মাত্র নিজেকে ছাড়া। অথবা নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরের কাছ থেকে শুধু সুবিধাটুকু আদায় করার চেষ্টায় একে অপরকে অপরিসীম ভালবাসার ভান করে। সীতা এতদিন অন্ধ করে রেখেছিল প্রণবকে ভাল-বাসার নিখুঁত অভিনয়ে। আজ সে অভিনয়ের পালা সাঙ্গ হল। সুনীত দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে পদস্থ চাকরি পাওয়ায় সীতা ওর অভিনয়ের একটা অঙ্কের যবনিকা নিজের হাতে টেনে দিয়ে গেল। কে জানে হয়তো দিল্লীর মাটিতে আবার নতুন করে আরম্ভ হবে জীবন-নাটকের আর এক অঙ্ক।

আজ অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল প্রণবের। গলির মোড়ের গ্যাসের বাতিটা বাতিওয়ালা জ্বেলে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সামনের বাড়ীর দেউড়ির হিন্দুস্থানীটা সুর করে তুলসীদাস পড়ছে মাথা নেড়ে নেড়ে। ক'জন স্বজাতীয় ওকে ঘিরে বসে আছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে। থেকে থেকে ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল। অথচ আশ্চর্য, প্রণব দেখলো ওদের ফ্ল্যাটটা তখনও অন্ধকার। ও ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে বাতিটা জ্বালালো। তারপর শব্দ করে জুতো জোড়া খুলে ফেললো। তবুও সাড়া পাওয়া গেল না সীতার। ক্লান্ত দেহে ক্রমে মনের উত্তাপটা সংক্রামিত হতে লাগলো। হঠাৎ নজরে পড়লো টেবিলের ওপর পড়ে আছে এক টুকরো সাদা কাগজ। কাচের রঙিন পেপার ওয়েটের তলায়। প্রণব কাগজটা তুলে আলোর সামনে মেলে ধরলো। তাতে লেখা,—'আমি সুনীতের সঙ্গে চললাম। মিথ্যে আমার খোঁজ করো না। আমায় পাবে না।' মুহূর্তে একটা শিহরন খেলে গেলো প্রণবের সমস্ত দেহে। সীতা, এটা কি সীতার হাতের লেখা! তা হ'লে....? হঠাৎ প্রণবের মনে হল, ঘরের বিজলী বাতিটা যেন ওর ঔজ্জ্বল্য হারাতে শুরু করেছে। প্রণব যেন আর এখন দেখতে পাচ্ছে না কিছু। এই ঘর, ঐ আলনা, ঐ আলমারি সব ঝাপসা অন্ধকার! চেয়ারটা ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলো প্রণব।

এ দুনিয়ার প্রতিটি সংসারই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। শৈশবে শত সহস্র ভয় ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে আমরা মাতা-পিতার কোলে মুখ লুকোই পরম বিশ্বাসে। যৌবনে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব আর মনের সব গোপনীয়তা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। বার্ধক্যে পুত্র-কন্যার কাছে নিজেকে একান্তে সঁপে দিয়ে শান্তি খুঁজি। এ বিশ্বাসের মাঝে কোথাও যদি প্রবঞ্চনা ঢোকে এতটুকু, তাহলে সংসারে শান্তি থাকে না।

হঠাৎ এক টুকরো হাসির শব্দ কানে আসতে প্রণব উঠে দাঁড়ালো। দেখলো লাইনের পশ্চিম দিকে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে ইতস্ততঃ। আর ভাঙা অনুচ্চ দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে এক পাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রণব ওদের চিনলো। দিনের সব হাট-বাজারের বিকিকিনি শেষ হয় যখন, তখন এ বাজারের দরাদরির প্রথম কিস্তি শুরু হয়। প্রণব ওদের ঘৃণা করতো মনে মনে। হয়তো বা ভয়ও পেত। ওরা সংসারের অনেক সর্বনাশের মূল। পৃথিবীর অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রচারক। অথচ প্রণব আজ এতটুকুও শঙ্কিত হ'ল না। বরং কি এক কৌতূহল ওকে গ্রাস করলো তৎক্ষণাৎ।

প্রণব রেল-লাইন ছেড়ে নেমে এলো নিচে। অভিজ্ঞ ক্রেতার মত একটি মেয়ের হাতে ধরা আলোটার একান্তে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিজের হাতেই আলোটা মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে কি যেন দেখলো একপলক। কি ভেবে হাতটা বোধহয় একবার কেঁপে উঠেছিল। হাতের আলোটা মাটিতে পড়ে যেতে প্রণব কোনরকমে ধরে ফেললো। হারিকেনের কাচটা ভীষণ উত্তপ্ত। তবুও সে উত্তাপে হাত দুটো ওর পুড়লো না এতটুকুও। বরং মনে হল কোন এক শীতের রাতে ওর বরফ ঠাণ্ডা হাত দুটো উষ্ণ করে নিতে ও যেন সীতার কবোষ্ণ বুকের গভীরতায় হাত রেখেছে। মেয়েটি এবার প্রণবের মুখের পানে তাকালো। প্রণব মুখে কোন কথা

বললো না। শুধু চোখের ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বললো। সরু দেড় হাত চওড়া একটা গলি ধরে ওরা এগিয়ে চললো। ডান দিকে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। কোন কোন ঘর থেকে এক টুকরো অতি ম্লান আলো এসে লুটিয়েছিল সেই সরু পথের ওপর। কোন কোন ঘর একান্ত অন্ধকার। মেয়েটি অমনি একটা ঘরে ঢুকলো। এক দরজাওয়ালা ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা চৌকি পাতা। দু' বালিশওয়ালা নির্ভাজ বিছানাটা দেখে মনে হয় ওটা এখনও অকলঙ্কিত। বিছানাটার মাথার দিকে একটা জানলা। আর দেওয়াল জুড়ে ক'জন মহাপুরুষের কাচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

প্রণব নিজেকে হঠাৎ এ পরিবেশে চিন্তা করে শঙ্কিত হল। এ আজ করছে কি প্রণব! জীবনের সততা আর সকল সংযম আজ বিকোতে বসেছে ও কিসের মূল্যে? যাদের ও মনে করতো সমাজের কলঙ্ক বলে, যাদের ও সামান্যতম দয়া দেখাতেও ঘৃণা বোধ করতো—ও আজ তাদেরই ঘরে! প্রণব ভয় ভয় চোখে একবার মেয়েটির দিকে তাকালো। ও তখন দু'হাত মাথার ওপর তুলে কুন্তল পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। আর অপাঙ্গে প্রণবের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল মৃদু মৃদু। চুল বাঁধার এ বিশেষ ভঙ্গিটা দেখে প্রণবের আবার সীতাকে মনে পড়ে গেল। প্রণব দেখেছিল সীতাকে ঠিক এমনি ভাবে কতদিন চুল বাঁধতে। নিজের অজ্ঞাতে আবার সীতার কথা মনে আসায় ও উত্তেজিত হল। হঠাৎ কি করবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে ও টেনে নিয়ে এলো নিজের কাছে। সীতা দেখুক, সীতা জানুক। যে সীতার অশরীরী উপস্থিতি প্রণবের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে, সে দেখুক প্রণবও নষ্ট হতে পারে। জীবনে অন্ততঃ একবার ও সীতার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে।

—বাতিটা কি নিভিয়ে দেব?—মেয়েটি জামার বোতাম কটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো।

—থাক্ না। কি দরকার নেবাবার?

সে কথা শুনে মেয়েটি একটু হাসলো।

প্রণব বুঝলো কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই ও চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোণে পায়া ভাঙা টেবিলের ওপর রাখা বাতিটা ও নিজের হাতে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার। জমাট অন্ধকার। সৃষ্টির সেই আদিম অন্ধকার এসে গ্রাস করলো দু'জনকে। প্রণব মেয়েটিকে আলতো করে স্পর্শ করতে চাইলো। মেয়েটি ওর আরও একান্তে সরে এলো। প্রণব ওর বুকের কোমলতায় কান পাতলো। আর ওর বুকের স্পন্দনের দ্রুততা শুনতে শুনতে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগলো। পাশের কোন একটা ঘরে একটা বেসুরো হারমোনিয়ম বাজছিল। সে সুরে গলা মেলাতে একটা মেয়ের অক্লান্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছিল। প্রণব গান-বাজনা ভাল বোঝে না। তবুও ওর মনে হল হয়তো চেষ্টা করলে ও ঐ মেয়েটির চেয়ে ভাল গান গাইতে পারবে। দূর থেকে একটা আওয়াজ আসছিল নূপুরের। হয়তো অতিথির মন রাখতে কোন মেয়ে নেচে চলেছে। উঃ ঘরটা কি গরম! প্রণবের মনে হল। অথবা প্রণবেরই শুধু গরম লাগছে এখন। বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমেছে কপালে। পাঞ্জাবিটা গায়ে লেপটে আছে ভেজা কাপড়ের মত। প্রণব এখন খুব পিপাসার্ত বোধ করলো। মনে হল ওর গলা যেন শুকিয়ে আসছে। এখনই একটু জল না পেলে ও হয়তো মারা যাবে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে। আশ্চর্য! এখনও মৃত্যু ভয়? যে মৃত্যুকে ও খুঁজতে বেরিয়েছে, আজ তার মুখোমুখি দাঁড়াতে তবে ভয় পাচ্ছে কেন! দূরের লোকো সেডে একটা ইঞ্জিন হঠাৎ ক'বার চিৎকার করে উঠলো। সে আওয়াজে প্রনব সচেতন হল। মনে পড়লো আজ রাতের শেষ ট্রেনটা আসবে ঠিক ন'টা চল্লিশে।

ন'টা চল্লিশ! কটা বাজছে এখন? সময় কি পার হয়ে গেছে? গাড়ীটা কি তবে চলে গেছে? প্রণব মেয়েটির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালো। এখন কটা বাজে একবার জানা দরকার।

—তোমার ঘরে কি ঘড়ি আছে?—প্রণব মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো। যদিও ও জানে ঘড়ি রাখার মত ক্ষমতা এদের থাকা সম্ভব নয়।

—হ্যাঁ আছে বাবু।

—আছে! প্রণব একটু আশ্চর্য হ'ল।—দেখো তো ক'টা বাজে।

মেয়েটি উঠে আলোটা জ্বাললো। আলো জ্বলতেই

প্রণব ঘরের চারিদিকে তাকালো। এবার ও ঘড়িটাকে দেখতে পেল। চৌকোনো দেওয়াল গহ্বরে রাখা আছে একটা টেবিল ঘড়ি। প্রণব ঘরে ঢোকার সময় ঘড়িটাকে দেখতে পায়নি। ঘড়ির কাঁটা দুটো লক্ষ্য করতে পেরে প্রণব ব্যস্ত হল। ন'টা পঁয়ত্রিশ। আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। এখানে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা সংগত হবে না। প্রণব ভাবলো মনে মনে।

—আমি এবার যাব। প্রণব মেয়েটিকে বললো।

—সে কি বাবু! এইতো সবে এলেন। এরই মধ্যে? আপকো মর্জি!

—হ্যাঁ এখুনি আমি যাব। যাওয়া আমার দরকার।

প্রণব পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলো। ব্যাগটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর ব্যাগটা মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বাইরেটা কি বিশ্রী অন্ধকার। প্রণব প্রথমে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেল না। একটু পরে আঁধারটা চোখে সয়ে যেতে প্রণব পায়ের তলার রাস্তাটাকে লক্ষ্য করতে পারলো। ওদের ঘরগুলোকে পেছনে ফেলে ও ততক্ষণে লাইনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণব দেখলো ক'টা মেয়ে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভাগ্যে এখনও কোন ক্রেতার দাক্ষিণ্য জোটে নি। প্রণব অন্ধকারেও ওদের মুখাবয়বের হতাশ ভাব আন্দাজ করতে পারলো।

মেয়ে কটাকে পেছনে ফেলে প্রণব আরও একটু উত্তরে এগিয়ে গেল। তারপর মাথার ওপরের শুদ্ধ আকাশের গায়ে চোখ রাখলো। শীতের দাপটে তারা-গুলো কাঁপছিল যেন। তবু ওরা কি সুন্দর! মনে হ'ল আকাশের অগণিত তারারা যেন প্রণবের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে। যেন ওরা ডাকছে প্রণবকে। ছোট-বেলায় মা বলতেন, মারা গেলে সবাই নাকি আকাশের গায়ে এক একটি তারা হয়ে ফোটে। ছোট বয়সে সে কথাটাকে প্রণব সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। তারপর স্কুলে ঢুকে প্রণব জেনেছিল কথাটা মায়ের নেহাতই মনগড়া। কিন্তু আজ এই প্রশান্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে [illegible] সেই কথা কটাকে সত্যি বলে মনে হ'ল।

অন্ততঃ সে কথাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো প্রতিটি তারা যেন এক একটি মৃত মানুষের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। প্রতিটি মানুষের মৃত্যুতে জন্ম হয়েছে এক একটি তারার।

তাই যদি সত্যি হয়, তবে নিশ্চয়ই কোন তারার মধ্যে লুকিয়ে আছে তার মায়ের আত্মা। বাবাও হয়ত আছে এইরকম ভাবে। প্রণব এত নক্ষত্রের ভিড়ে আলাদার করে কাউকে যেন চিনতে পারছে না। এখন না পারুক, আর মাত্র ক' মিনিট পরে ও নিশ্চয়ই সবাইকে খুঁজে খুঁজে বার করতে পারবে। মা, বাবা, বড়দি, সবাইকে। ট্রেনটা ঐ ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আঁধারের বুক চিরে ইঞ্জিনের হেড লাইটের আলোটা লাইনের বুকে আছড়ে পড়েছে। ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ প্রণব এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল।

লাইনের পাশের সরু পথটা ধরে কে যেন আসছে এদিকে। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দ্রুত পায়ে। প্রণব পথ থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। লোকটাকে পথ করে দিতে চাইলো। কাছাকাছি এসে লোকটা দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। তারপর অতি অসভ্যের মত আলোটা প্রণবের মুখের পরে ধরলো। আলোর জোয়ারে চমকে গিয়ে প্রণব তাড়াতাড়ি দু'চোখ বুঁজলো। লোকটা কি জানোয়ার! প্রণব মনে মনে রেগে উঠেছে ততক্ষণে।

—আপনাকে খুঁজতেই ছুটে আসছি বাবু। একটা নারীকণ্ঠ প্রণবকে লক্ষ্য করে কথা ক'টা বললো।

—আমাকে? আমাকে কি দরকার! ট্রেনটা বোধহয় আগের ষ্টেশন ছেড়েছে। 'ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যালের' লাল আলোটা রঙ পালটে নীল হয়ে গেছে। ট্রেনটা আসছে। অন্ধকারকে দু'ভাগ করে হেড লাইটটা পথ দেখাচ্ছে।

—আমি রুকমী, বাবু।

—রুকমী! সে কে? আমি তো সারা জীবন সীতা ছাড়া অন্য কাউকে চিনতাম না। সমস্ত জীবন শুধু সীতাকেই ভালবাসতে চেয়েছিলাম।

—বারে! একটু আগে যে আপনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে না?

—ও হ্যাঁ। তুমি সে! কিন্তু তুমি এখানে কেন?

[illegible] তুমি এখন এখান থেকে চলে যাও।

—আপনি আমায় ক' টাকা দিয়েছেন বাবু?

—ক' টাকা!—মনে মনে হিসেব করলো প্রণব। আজ মাইনে পেয়েছে তিনশো টাকা। তা' থেকে বড় জোর খরচ করেছিল মাত্র গোটা দশেক টাকা। তা হ'লে....?—কেন, তোমার কি টাকা কম হয়েছে? হয়ে থাকলেও আমার কাছে আর টাকা নেই। আর তো আমি দিতে পারবো না।

—না, না। কম কেন হবে বাবু। এতো আমার সমস্ত মাসের রোজগার। অত টাকা আমায় দিলেন কেন বাবু?

—তা' হোক, তুমি নাও। আমি খুশী হয়ে দিলাম। ট্রেনটা আসছে। প্ল্যাটফর্মকে পেছনে ফেলে ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। একটু চেষ্টা করতেই প্রণব ইঞ্জিনটার আবছা অবয়বকে নজর করতে পারলো।

—না বাবু, এত টাকা আমি নিতে পারবো না। আজ সারা রাত থাকলে আমার পাওনা হত দশ টাকা। সে টাকাটাই আমি নিচ্ছি। বাকী টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন।

ট্রেনটা এসে গেছে। বগির জানলা দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে কটা স্নান করছে। প্রণব ব্যস্ত হল। রুকমীর দিকে শেষ বার ফিরে তাকালো। —রুকমী তুমি টাকা কটা নাও। আমি তোমাকে ভালবেসে ওগুলো দিলাম। আর এখুনি চলে যাও এখান থেকে।

—তা হয় না বাবু। মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণবের হাত ধরলো। আজ আপনার মন নিশ্চয়ই ঠিক নেই বাবু। তাই এ কথা বলছেন। কাল ভোরে মন ঠিক হলে টাকার জন্যে আমায় হয়তো অভিশাপ দেবেন। বলবেন মেয়েদের ভালবাসলে কেবল ঠকতে হয়। ধরুন আপনার ব্যাগটা। —রুকমী প্রণবের দেওয়া ব্যাগটা তুলে দিল প্রণবের ডান হাতে। এবার আমি যাই বাবু। আর মেয়ে কস্তুর মাপ কিজিয়ে। আমার নাম রুকমী। নাম করলে সবাই আমার ঘর দেখিয়ে দেবে। মর্জি হলে আবার আসবেন। নমস্তে।

ট্রেনটা চলে গেল। প্রণবকে পেছনে ফেলে আর রাতের নিস্তব্ধতাকে ধমক দিতে দিতে ট্রেণটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। ট্রেনের পেছনের লাল আলোটা অন্ধকারের বুকে তখনও জ্বলছে দপ্‌দপ্ করে। প্রণব হেরে গেছে। ঐ আলোটার চোখ রাঙানির কাছে হেরে গেছে প্রণব। ও আবার আকাশের দিকে চোখ তুললো।

নিশীথের মৌনতায় নিশ্চুপ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আকাশের তারাগুলো জেগে আছে। একটা তারাকে প্রণবের হঠাৎ বড় পরিচিত বলে মনে হল। মায়ের মুখের আদলের সঙ্গে ওটার বড় মিল। সে তারাটা যেন হাসছে মিটিমিটি প্রণবের দিকে তাকিয়ে। প্রণব হাতে ধরা ব্যাগটা আকাশের দিকে তুলে ধরলো। যেন সে ব্যাগটা মাকে দেখাতে চাইলো। তারপর প্রণব ফিরে চললো। লাইনের পাশের সেই সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে প্রণব এগিয়ে চললো। এখনও প্রণবকে ক'দিন বেঁচে থাকতে হবে। ক'দিন কে জানে! অন্ততঃ হাতের টাকা ক'টা খরচ করা পর্যন্ত তো বটেই। একটা নিঃশ্বাস বাইরের বাতাসে এসে মুক্তি পেল।

নিঃশ্বাস

শ্রীকিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশের অরুণিমা ডাকে না আমাকে
ঝড় জল বন্যা সব আদর জানায়—
অমৃতের কলসী আজ ভরে গেছে পাঁকে
জীবন সমুদ্র আজ পূর্ণ যে পানায়।
বাগানেতে ফোটে ফুল, উড়ে যায় চিল
সম্মুখের বাড়ী দুটো আকাশেতে বেঁধে :

জীবন আরম্ভ কবে শেষ বা কোথায়
পঞ্জিকাকে ঘেঁটে ঘেঁটে মেলে না সন্ধান,
নিয়তির আহ্বান শোনা নাহি যায়
কোথা হ'তে অতর্কিতে ছুঁড়ে দেয় বাণ।
মনোবীণা বেজে চলে সংগত-বিহীন
যে সুর উথলি ওঠে কান পেতে শুনি,